



Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)

A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture

Volume - vi, Issue - iii, Published on July issue 2026, Page No. 338 - 349

Website: <https://tirj.org.in/tirj>, Mail ID: editor@tirj.org.in

(SJIF) Impact Factor 8.111, e ISSN : 2583 - 0848

মনোজ মিত্রের নাট্যসংলাপ : বহুবর্ণী স্বরের বিচিত্র আলাপন

ড. রফিকুল ইসলাম

সহযোগী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ

মুর্শিদাবাদ মহারাজা কৃষ্ণনাথ বিশ্ববিদ্যালয়, বহরমপুর

Email ID: rafikulislamknc17@gmail.com



Received Date 15. 06. 2026

Selection Date 15. 07. 2026

Keyword

Effective dialogue, regionalism or dialectalism, Monologue, Decency and indecency, Bengali dialect, Humorous dialogue, long poetic dialogue, fast-paced snappy dialogue,

Abstract

Dialogue is the very lifeblood of drama. Through dialogue, a playwright not only constructs the plot and develops the characters but also reveals the inner world of the dramatis personae. A playwright's success largely depends on the quality of his dramatic dialogue. While conscious effort and careful craftsmanship are essential, the creation of truly effective dialogue ultimately requires innate talent. Manoj Mitra possessed this rare gift, which made him one of the most popular and widely acclaimed playwrights among his contemporaries.

In nearly a hundred plays, Manoj Mitra portrayed people from diverse social, economic, cultural, and intellectual backgrounds, giving each character an authentic and appropriate mode of speech. A considerable number of his plays are set against rural backdrops and revolve around village life. Accordingly, the dialogues of these characters are enriched with regional vocabulary and dialectal expressions. In his notable play Chakbhang Madhu, the characters Matla and Jata speak in the dialect of southern Bengal. Similarly, Gandhakali in Paliye Beray uses the same southern Bengali speech pattern.

In his most celebrated play, Sajano Bagan, Manoj Mitra employed the dialect of the Khulna region, familiar from his childhood, in the dialogues of Bancharam. Bancharam's speech is further distinguished by rustic pronunciations and the incorporation of several English words in their colloquial forms. These features have made Bancharam one of Manoj Mitra's most unique and unforgettable creations.

In Ami Madan Bolchhi, the dialect of the Hasnabad region is prominently used. The entire play consists of Madan's extended monologue. Through his remarkable skill in crafting dialogue, the playwright succeeds in sustaining the attention of both the audience and listeners throughout the play. The use of Bengali dialects also contributes significantly to its humour. The

dialogues of Ataullah in Paliye Beray and Chhana in Smritisudha are excellent examples of this comic effect.

Manoj Mitra also introduced several non-Bengali business-class characters into his plays. Their dialogues, blending Bengali with Hindi, create an engaging and entertaining linguistic flavour. In some plays, Muslim characters speak in a language heavily influenced by Arabic, Persian, Urdu, and Hindi. Numerous examples of this can be found in Galpo Hekim Saheb.

The play *Devi Sarpamasta* is centred on the folk goddess Sarpamasta, worshipped in the forested and hilly regions. In the dialogues and songs of characters such as Dahuk and Kundala, the playwright combines their local dialect with the literary language Brajabuli.

Indeed, Manoj Mitra's plays provide rich material for sociolinguistic study, demonstrating how linguistic forms evolve alongside changes in social and cultural contexts. While composing dialogues, the playwright was not merely concerned with linguistic variation; he also ensured that every dialogue remained perfectly suited to its dramatic situation and environment.

To reveal the psychological depths of his characters, Manoj Mitra frequently employed long speeches. Yet, their length never slows the dramatic pace. Instead, these dialogues possess a poetic quality that enhances both characterization and the aesthetic appeal of the plays. At the same time, his works also contain numerous short dialogues. In *Dampati*, for example, the exchanges between the husband and wife during their quarrels.

Discussion

সংলাপ-ই যে নাটকের প্রাণ-এ বিষয়ে কোন দ্বিমত নেই। মূকাভিনয়ের কথা স্মরণে রেখেও বলা যায় নাটক রচয়িতার সাফল্যের মূল চাবিকাঠি তাঁর নাটকের সংলাপ। কেননা সংলাপ বাদ দিয়ে কোন নাটকের কাহিনি-গ্রন্থন ও চরিত্রসৃজন সম্ভব নয়। শুধু কাহিনি গ্রন্থন ও চরিত্র সৃজন নয়, সংলাপ ছাড়া নাট্যকারের অভিপ্রায়ে উপস্থাপন এবং রসসৃষ্টিও অধরা থেকে যায়। নাট্য-সংলাপের এই গুরুত্ব বিষয়ে নাট্য-বিশারদের মন্তব্য স্মরণীয়—

“নাটকের কাহিনি ও চরিত্রসৃষ্টির প্রধান উপায় হল সংলাপ। সংলাপ শুধুমাত্র নাট্যচরিত্রের কথা নয়, সংলাপ নাট্যকারের রসসৃষ্টি ও তত্ত্বপ্রচারের প্রধান বাহন। এজন্য নাটকে সংলাপের গুরুত্ব এত বেশি।”^১

উপন্যাস ছোটগল্পেও সংলাপের গুরুত্ব রয়েছে। তবে নাটকে সংলাপ যেমন প্রাণস্বরূপ, কথাসাহিত্যে তা নয়। সেখানে সংলাপ ছাড়াও লেখক বা কথকের বর্ণনা-বিশ্লেষণ থাকে এবং বস্তুত তারই পরিপূরক রূপে আসে সংলাপ। কিন্তু নাটকে সংলাপের কোনো বিকল্প থাকে না। শুধু তাই নয়, নাটকের সংলাপকে বিশেষ নাট্যগুণে সমৃদ্ধও হতে হয়। কাহিনির গতি ও নাট্যদ্বন্দ্বকে ধারণ করে থাকে নাটকের সংলাপ। নাট্য-চমক ও কৌতুহল সৃষ্টির প্রধান অবলম্বনও সংলাপ।

সংলাপের ভালোমন্দের ওপরেই একজন নাট্যকারের সার্থকতা-বিফলতা নির্ভরশীল। সে কারণেই সংলাপ রচনায় অতিমাত্রায় সচেতন হতে হয় নাট্যকারকে। পরিবেশ ও চরিত্রের সঙ্গে যখন সঙ্গতি রক্ষা করতে সক্ষম হয় সংলাপ, তখনই তা সার্থক হয়ে ওঠে। সার্থক সংলাপ বা শ্রেষ্ঠ সংলাপ সম্পর্কে নাট্যকার ড. মনমথ রায় বলেন -

“শ্রেষ্ঠ নাট্য-সংলাপ হবে নাটকের বিষয় বস্তু যে দৃশ্যে যেভাবে যখন যেমন প্রস্তুতি হবে প্রবাহিত হবে তখন সেই দৃশ্য অনুযায়ী, অবস্থিতি অনুযায়ী, পরিস্থিতি অনুযায়ী তার সংলাপ হওয়া উচিত।”^২

এ বিষয়ে অপর এক নাট্যকার মোহিত চট্টোপাধ্যায় সংলাপের সঙ্গে দেশ-কাল-জলবায়ুর সম্পৃক্ততার ওপর গুরুত্ব আরোপ করেন -

“নাটকের সংলাপ দেশ-কালের বিশেষ একটি পরিপ্রেক্ষিতের সঙ্গে সম্পর্ক-যুক্ত। নাটকের চরিত্রটি যে-পরিবেশে গড়ে ওঠে এবং যে সময়ের জলবায়ুতে নিঃশ্বাস নেয় সেই স্থান-কালে বিধৃত পরিমণ্ডল থেকেই

তার সংলাপ উচ্চারিত হয়। এই দেশ-কালই হচ্ছে সংলাপের পরিপ্রেক্ষিত। এই পরিপ্রেক্ষিতের প্রভাব থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে সংলাপ কখনোই প্রাণ পাবে না।”^৩

এই দুই নাট্যব্যক্তিত্বের পাশে সংলাপ সম্পর্কে নাট্যকার মনোজ মিত্রের বক্তব্যও আমরা স্মরণ করতে পারি। নাটকের সংলাপ কেমন হওয়া উচিত বা সংলাপ সৃষ্টির সময় নাট্যকার কোন কোন বিষয়গুলি গুরুত্ব দেবেন সে বিষয়ে এক সাক্ষাৎকারে মনোজ মিত্র বলেন -

“সংলাপকে তো পরিস্থিতি, পরিবেশ চরিত্রের সঙ্গে মানানসই হতে হবে। কে বলছে কোথায় বলছে, কেন বলছে, কখন বলছে, কাকে বলছে এটাই হচ্ছে বড় ব্যাপার।”^৪

‘শ্রেষ্ঠ নাট্য সংলাপের গুণ কী কী’-এমন প্রশ্নের উত্তরে নাট্য-সংলাপের কতকগুলি বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করেছেন নাট্যকার উৎপল দত্ত—

“শ্রেষ্ঠ নাট্য-সংলাপের গুণ— (১) সংক্ষিপ্ততা। এই গুণ নাটকের কাহিনিকে দ্রুত এগিয়ে নিয়ে যেতে সাহায্য করে। নাটককে গতি দান করবে। নাট্য কাহিনিকে বাহ্যিক বর্জিত করবে। (২) বক্তা বা চরিত্রের মনের ভাব সুস্পষ্টভাবে প্রকাশ করবে। (৩) কবিত্বশক্তি শ্রেষ্ঠ নাট্য সংলাপের আর একটি গুণ।”^৫

নাটকের সংলাপ রচনার সময়ে একজন নাট্যকার যথেষ্ট সচেতন ও মনোযোগী হবেন-এটাই প্রত্যাশিত। কিন্তু এ কথাও ঠিক যে শুধু মনোযোগ ও সচেতনতাই এক্ষেত্রে যথেষ্ট নয়। সার্থক সংলাপ সৃষ্টি সহজাত দক্ষতারও অপেক্ষা রাখে।

নাট্যকার মনোজ মিত্রের ঈর্ষণীয় জনপ্রিয়তা তথা সাফল্যের মূলে তাঁর নাটকের চরিত্রোপযোগী সংলাপ। ছোট-বড়ো মিলিয়ে তাঁর নাটকের সংখ্যা একশ’র কাছাকাছি। নানা সামাজিক ও বৌদ্ধিক স্তর থেকে অজস্র চরিত্র উঠে এসেছে তাঁর নাটকে। তাদের হাজার সমস্যা সংকট, অনুভূতি-উপলব্ধি-অভিজ্ঞতাকে উপস্থাপন করেছেন মনোজ মিত্র তাঁর নাটকের দর্পণে। স্বাভাবিকভাবে সেইসব চরিত্রের বাহ্যিক ও মানসিক অবস্থাকে তুলে ধরতে সংলাপ রচনায় বিশেষ মনোনিবেশ করতে হয়েছে তাঁকে। তাছাড়া মনোজের নাটকে কেবল সমকালীন মানুষজন নয়, ফেলে আসা অতীতের চরিত্ররাও ভিড় করেছে সেখানে। তাদের বিশ্বাস্য করে তুলতে পরিবেশ পরিস্থিতির সঙ্গে সঙ্গতি রেখে তাদের মুখে চরিত্রানুগ সংলাপ জুড়েছেন নাট্যকার। ফলে মনোজের নাট্যশালায় আমরা বিচিত্র রকমের ভাষা-সংলাপ-বাকভঙ্গির ঐক্যমূল্যে শুনতে পাই।

মনোজের বেশকিছু নাটক গ্রামীণ পটভূমিতে গড়ে উঠেছে। ‘চাকভাঙা মধু’, ‘সাজানো বাগান’, ‘দর্পণে শরৎশশী’, ‘শিবের অসাধি’র মতো বিখ্যাত পূর্ণাঙ্গ নাটকগুলিতে গ্রামীণ পরিবেশে বেড়ে ওঠা মানুষদের দেখা মেলে। এই ধরনের চরিত্রের সংলাপে মনোজ সহজ নিত্য ব্যবহার্যতা বজায় রেখেছেন। তাদের বিশেষ বিশেষ অঞ্চলের আঞ্চলিকতাকেও ধরতে চেয়েছেন তাদের বাকভঙ্গিসহ। ‘চাকভাঙা মধু’র জটীর সংলাপ দৃষ্টান্ত হিসেবে উল্লেখ করা যায় -

“হ্যাঁ, তা বলে রুগীর গায়ে হাত দিবি। খালি ইদিক-উদিক ছুতোয় লাতায় ঘুরবি, ফিরবি, এটা করে ফ্যাচাং বার করবি ... ওষুধ লাড়াচাড়া করবি ... গাঁইগুঁই করবি ... মানে সুমায় লষ্ট করবি ... বস্, উদিকে মাছও দেখবি জলের তলে খেলতি লেগেছে! খটাখট আভা পড়ছে তোর পা’র পরে...”^৬

দক্ষিণবঙ্গের গ্রাম্য অশিক্ষিত মানুষের মুখের ভাষা মনোজের কলমে এখানে জীবন্ত হয়ে উঠেছে। এই সংলাপ শুধু আঞ্চলিকতাকে দেখায় না, মহাজনের শোষণে ওষ্ঠাগতপ্রাণ জটীর সামনে প্রতিশোধের সুযোগ এলে তার ভিতরে জেগে ওঠে যে ধূর্ততা, তাকেও উদ্ঘাটিত করে দেয়। ‘দোখনে’ অঞ্চলের গন্ধকালীকে পাওয়া যায় ‘পালিয়ে বেড়ায়’ নাটকে। তার সংলাপের ভাষায় আঞ্চলিক বৈশিষ্ট্য প্রতিফলিত হয়েছে -

“অ্যাঁই ... একখান নাকটাকার কথা! যে ছোট্টা সে ছোট্টবে, যে কাটার সে কাটবে, আবার কত নোক কাটবেও না। তা’লে? গন্ধকালী কেন এটাবেলা ছাড় পাবে না গো! তারাই শুধু এদেশে জন্মেছে, গন্ধকালী জন্মায়নি? তারাই শুধু ভুটার, গন্ধকালী ভুটার না?”^৭

‘নাকটাকা’, ‘নোক’, ‘এটা’ ‘ভুটার’ শব্দগুলি গন্ধকালী চরিত্রের গ্রাম্যতা, তার শ্রেণি-অবস্থানকে চিনিতে দেয়। ‘আমি মদন বলছি’ নাটকে দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার হাসনাবাদ অঞ্চলের উচ্চারণ রীতি ও বাকভঙ্গিকে সংলাপে তুলে এনেছেন নাট্যকার। নিজের গ্রামের বর্ণনা দিতে মদন দর্শকদের উদ্দেশ্যে বলেছে -

“...হাসনাবাদে নেমে গাঙ পার হয়ে হাঁটা জুড়লি ... সূর্য মাথার ওপর ... পড়বে কৈখালির বিল ... পা চালান বাবুমশায়রা, দক্ষিণ বরাবর কোরোশ তিন পথ মারতি পারলি ... হাই ... তেরান্তার বাঁকে দেখতেছেন জোড়া-খেরুরগাছ ... বাঁ হাতে রেখে যত এগোবেন তত বোঝবেন আপুনি তেঁতুলে বিষ্টুপরে ঢুকতেছেন।...”^৮

‘জুড়লি’, ‘মারতি পারলি’, ‘বোঝবেন’, ‘দেখতেছেন’, ‘ঢুকতেছেন’ — ক্রিয়াপদের এই রকম ভ্রংশ রূপের পাশাপাশি নামপদের সমীভবন (সূর্য) ও স্বরভক্তি (কোরোশ) ঐ অঞ্চলের আঞ্চলিকতাকে স্পষ্ট করে। আগাগোড়া নাটকটি মদনের একক সংলাপে রচিত। শুধুমাত্র সংলাপকে আশ্রয় করে নাট্যকাহিনিকে এগিয়ে নিয়ে যাবার এবং দর্শক-শ্রোতাদের আকর্ষণ ও মনোযোগ ধরে রাখার যাবতীয় দায়িত্ব পালন করতে হয়েছে মদন তথা তার স্রষ্টা মনোজকে। বলাবাহুল্য এ ক্ষেত্রে নাট্যকার মনোজ সম্মানের সঙ্গে উত্তীর্ণ হয়েছেন তাঁর সংলাপ সৃষ্টির নৈপুণ্যে।

নাট্যকার মনোজের সর্বাধিক খ্যাত ‘সাজানো বাগান’ও তাঁর সংলাপসৃজন নৈপুণ্যের পরিচয় ধারণ করে রয়েছে। বাগানের মালিক বাগ্গার মুখে যে ভাষা নাট্যকার বসিয়েছেন, তা তাঁর ফেলে-আসা জন্মস্থান খুলনা জেলার ভাষার কাছাকাছি। সমালোচক বলেন –

“বাগ্গারামের মুখে শোনা গেছে খুলনা জেলার মুখের ভাষার লবজ। এই লবজে কেটা হয় কেডা, বাগানটা হয় বাগানডা। প্রজাপতিকে বাগ্গা পোজাপতি বলে। লেবু, রাইট, লুচি, রাঙা উচ্চারিত হয় যথাক্রমে নেবু, নাইট, নুচি, নোভ, নাঙা।”^৯

‘চাকভাঙা মধু’ নাটকে নাট্যকার মনোজ সমস্ত দিক থেকে যেমন বাস্তবতার প্রতি অনুগত ছিলেন, ‘সাজানো বাগানে’ সে-অর্থে নয়। নাট্যঘটনায় বাস্তবতা-বিশ্বাস্যতার সীমা যেমন মনোজ ভেঙে দিয়েছেন, সংলাপেও তা কিছুটা হলেও ঘটেছে। সেজন্যই খুলনার প্রত্যন্ত অঞ্চলের বাসিন্দা বাগ্গা তার কথাবার্তায় যথেষ্ট ইংরেজি শব্দ ব্যবহার করে। সে সব শব্দ অবশ্য গ্রাম্য-বিকৃতি লাভ করেছে। ফাসকেলাস, ছুইছাইড, ভাইটামিন, কনসাল— এই রকম বেশ কিছু শব্দ তার বাগ্গার মুখে বেশ মানিয়ে যায়। বাগ্গার চরিত্রকে আকর্ষণীয় করেছে তার সংলাপের ‘অঙ্গীলতা’। ভূত ছকড়ি দত্তের অত্যাচার অতিষ্ঠ হয়ে বাগ্গা বলে উঠেছে –

“ওঝা ডেকে তোমারে সোজা করে দেবো! বাগ্গেং! আমার নেবুগাছে চড়ে পৌঁদপাকামি হচ্ছে।”^{১০}

রাগের মাথায় গ্রাম্য বাগ্গার মুখে উচ্চারিত এই সংলাপ অঙ্গীলতা-অঙ্গীলতার তর্ককে তুড়ি মেরে দর্শকের সহাস্য-সমর্থন আদায় করে নেয়।

মনোজের নাটকে কৌতুক-হাস্যের স্থান যে বেশি তা সর্বজনবিদিত। এই হাস্যরস সৃজনে সংলাপের বড় ভূমিকা রয়েছে। মনোজের নাটকে বঙ্গালী উপভাষা ও হিন্দি-বাংলা মিশ্রিত ভাষা এক্ষেত্রে তাঁর সহায় হয়েছে। ‘পালিয়ে বেড়ায়’ নাটকের বাংলাদেশী চরিত্র আতাউল্লা, ‘টু-ইন-ওয়ান’ নাটকের ফৈজী, ‘স্মৃতিসুখা’ নাটকের ছানার সংলাপে বঙ্গালী উপভাষার প্রয়োগ যথেষ্ট মজাদার হয়ে উঠেছে। এই ধরনের সংলাপের দৃষ্টান্ত –

১. ছানা।। ক্যান, শুধু তারাই ক্যান? আত্মীয় কুটুম বন্ধুবান্ধব নাই? মামু তো হকলেরেই ইনভাইট করছেন। পত্তরও ছাড়ছেন বিস্তর। আজ আবার পেপারে মামীর ছবি ছাইপা অ্যাডভাটাইজ করছেন, আসো, যে যেখানে পরিচিত আছো, চইলা আসো। দ্যাখেন নাই?”^{১১}

২. ফৈজী।। (দর্শকদের উদ্দেশ্যে) হায় হায় হায় ... কী কমু জনাব, কী আর কমু? সেলাম আলেকুম ... আলেকুম আসেলাম ... যাগো দ্যাখবার লাইগা আপনাগো আজ জমায়েত হইছে ... ত্যাগো একটাও বাঁইচা নাই।...”^{১২}

হিন্দি-বাংলা মিশ্রিত ভাষা প্রয়োগ করেছেন ‘পালিয়ে বেড়ায়’ নাটকের ভানুপ্রসাদ, ‘নরক গুলজার’ নাটকের পান্নালাল, ‘সত্যি ভূতের গল্পো’ নাটকের ঘটোৎকচ চনচনিয়া, কিম্বা ‘দম্পতি’ নাটকের শুকলালের সংলাপে। বঙ্গালী উপভাষার মতো এই মিশ্রভাষার সংলাপও দর্শকদের কাছে আকর্ষণীয় হয়ে ওঠে। ‘সত্যি ভূতের গল্পো’ নাটক থেকে ঘটোৎকচ চনচনিয়ার একটি সংলাপ দৃষ্টান্ত হিসাবে উল্লেখ করা যেতে পারে –

“ঘুম কেনো হনুমানজী, এতো আমি খুশ হয়ে আপনাকে পূজা দিচ্ছি। সেখানে বহত রূপেয়া কামাবো—
ভগোয়ানের গোড়ে কুছু তো হামাকে ইন্ডেসট করতেই হোবে। তুমতি খাবে হামতি খাবে।”^{১৩}

এই অবাঙালি চরিত্ররা সবাই ব্যবসায়ী শ্রেণির, যারা ইন্ডেসট করে মুনাফা কামাতে চায় এবং তার জন্য ‘ভগোয়ান’কেও ঘুম দিতে চায় এরা। এদের সংলাপ তাই শুধু হাস্যরসের জোগান দেয় না, সেই সঙ্গে শ্রেণি চরিত্রকেও উন্মোচিত করে।

মনোজ মিত্রের বেশ কিছু নাটকে স্বর্গের দেবদেবীদের চরিত্র রূপে হাজির করেছেন। সেগুলির মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ‘নরক গুলজার’ নাটকটি। সিরিও-কমিক এই অনন্যসাধারণ নাটকটিতে ব্রহ্মা, চিত্রগুপ্ত, নারদের মতো স্বর্গের চরিত্রগুলিকে বড়ো মজাদার করে এঁকেছেন। যমরাজের বৌগুলির প্রতি ব্রহ্মার একটি আলাদা টান আছে। তাদেরই একজন হারিয়ে গেছে। এই নিয়েই তাদের কথোপকথন –

ব্রহ্মা।। এইবার বলো, কী হয়েছে? নাতবৌরা সব কেমন আছে? বড়ো ভাল বৌগুলো তোমার যম...

নারদ।। বিশেষ করে বারো নম্বরটি! একটি কাশ্মিরী ফারের কোট!

ব্রহ্মা।। কোট! দেখলেই যমের ওপর আমার সব রাগ পড়ে যায়...! কাশ্মিরী ফার...! দেখছিনে কেন!

যম।। (ডুকরে ওঠে) সে আর নেই ঠাকুরদা... আপনার নাতবৌ ছেঁস্তাই হয়ে গেছে!

ব্রহ্মা।। কী সর্বনাশ! ছেঁস্তাই! নাতবৌ! উত্তিষ্ঠ! উত্তিষ্ঠ! ওরে ওঠ না! চিত্রগুপ্ত!”^{১৪}

বোঝাই যায় এখানে দেবতার মানবায়ন ঘটেছে। বিশ্বস্ত্রষ্টা ব্রহ্মার শুধু নয়, যম ও নারদেরও মানুষী দুর্বলতা স্পষ্ট তাদের সংলাপে। বারো নম্বর বৌ এবং তার উপমান কাশ্মিরী ফার— এমন কল্পনাও সম্ভব! ব্রহ্মার বাক্‌ভঙ্গিও লক্ষ্য করার মতো। নাট্যকারের উৎকেন্দ্রিক কল্পনা ও কৌতুকপ্রদ সংলাপ এই নাটকটিকে ঈর্ষণীয় জনপ্রিয়তা এনে দিয়েছিল। প্রসঙ্গত এই নাটকের আর এক টুকরো দৃশ্য উদ্ধার করা যাক, যেখানে সংলাপের মধ্য দিয়ে স্বর্গগত দুই ‘মহাপুরুষের’ তথা ভণ্ড বাবাজী গুঁইবাবা ও তার চ্যালা পান্নালালের স্বরূপ উদ্ঘাটিত হয়ে যায় –

গুঁই।। যখন মর্তে ছিনু ... কতো মেয়েছেলে ... সখবা, বিধবা, কলেজের ছাত্রী...আর কতো অফিসার
প্রফেসর ডক্টরেট এডভোকেটের এড্‌কেটেড্‌ ওয়াইফ্রা আমার ডাইনে বাঁয়ে, কোলেপিঠে ঝুলে ... আমায়
ওডিকোলন মাখাতো। স্বর্গে এসে একটাও পেনু না। একটাও অঙ্গরাই যদি না পেনু ... কেন সাধন
করিনু ... কেন স্বর্গে এনু পানু?

পান্না।। কেন কাঁদছেন, এখুনি পেয়ে যাবেন ... ডাকেন তো!

গুঁই।। (থলিতে মুখ দিয়ে) রম্ভা ... আয় তো আমার রম্ভা! (থলিতে হাত ঢুকিয়ে) কই?

পান্না।। মৌজ করে ডাকেন, তবে তো আসবে...

গুঁই।। রম্ভা প্রিয়ে, তোমায় যেমনি দেখিনু ... প্রেমশর খাইনু! ইন্ডের নাচঘরে তোমার জজ্বা দেখেছিনু...

পান্না।। (সোল্লাসে) দেখেছেন!

গুঁই।। (হাটু থেকে গোড়ালি পর্যন্ত দেখিয়ে) এই থেকে এইটুকুরে ব্যাটা! একেই বলে জজ্বা! ...এসো
প্রিয়ে রম্ভা...দরশন দাও...এ হিয়া রাখিতে নারিনু...ওগো বরতনু! ডাক না!

পান্না।। (থলিতে মুখ দিয়ে) আ যা! আ যা!

গুঁই।। (সুরে) আয়া আয়া, মেরে রম্ভা আয়া...

গুঁই ও পান্না।। (সুরে) আ আ আয়া... আ আ আয়া...”^{১৫}

অসাধারণ দক্ষতায় মনোজ মিত্র এমন সংলাপ রচনা করেছেন। কাব্যগন্ধী ভাষার এই সংলাপে গুঁইবাবার ভণ্ডামি, তার নারীসঙ্গ লোলুপতা পরম উপভোগ্য হয়ে উঠেছে। আবার এর মধ্য দিয়ে নাট্যকার উচ্চশিক্ষিত ঘরের মহিলাদের বাবাজীপ্রিয়তা এবং তাদের শিক্ষার অন্তসারশূন্যতাকেই ইঙ্গিত করেছেন নাট্যকার। শেষ অংশে তিসরি মঞ্জিল নামের হিন্দি সিনেমার মহম্মদ রফির গাওয়া গানের সুর ও কথার অসাধারণ প্রয়োগ মনোজ মিত্রের শিল্পসিদ্ধির পরিচায়ক।

সামাজিক শ্রেণি অবস্থানে মানুষের মুখের ভাষারও বদল হয়। যারা এই বিষয় নিয়ে সমাজ ভাষাতত্ত্বের এই গবেষণা করতে চান, তারা মনোজের নাটকের সংলাপ নিয়ে ভাবতে পারেন। মুসলমান সমাজের অন্তর্গত নরনারীর ভাষা

যে সাধারণ বাঙালী হিন্দুর ভাষা থেকে স্বতন্ত্র একথা মনোজের জানা ছিল বলেই ‘গল্প হেকিমসাহেব’-এর সংলাপ সৃজনে অসাধারণ নিপুণতার স্বাক্ষর রাখেন মনোজ। ফকির কিংবা হেকিম সাহেবদের বাংলা সংলাপে জীবন্ত হয়ে ওঠে এসব চরিত্রগুলি। দু’-একটি দৃষ্টান্ত—

১. ফকির।। (দর্শকদের উদ্দেশ্যে) মুশকিল আসান হোক। খোদাতালার অফুরাণ দোয়া বরষার ধারার মতো ঝরে পড়ুক আপনাদের সবাকার উপর। আল্লা আপনাদের নীরোগ করেন, বালবাচ্চা নিয়ে বেঁচে বর্তে থাকেন সব। বাপজানেরা, আমি ফকির মানুষ, ঘুরে ঘুরে কাটে আমার।^{১৬}

২. হেকিম।। কহে যারা তারা দুশমনের গোলামি করবে বলেই জন্মেছে। বাঈসাহেব সব রোগেরই প্রতিবিধান আছে এই দুনিয়ায়। তামাম দুনিয়ার হিম্মতের চেয়ে একটি ব্যাধির দবদবা কখনো বেশি হতে পারে না বাঈ। এই সবুবা গাছপালা মেঘ জোছনা মিঠে পানি হাওয়ার চেয়ে কটি বীজানুর তাকৎ বেশি, এ কখনো হয়?^{১৭}

আরবী ফারসী উর্দু হিন্দির আধিক্য মুসলমান সমাজের ভাষার স্বাতন্ত্র্যকে চিনিতে দেয়। চরিত্রোপযোগী সংলাপ উভয় চরিত্রের শুভ বোধসম্পন্ন দরদী মনোভাবকেও প্রকাশ করে।

কাব্যধর্মিতা শ্রেষ্ঠ নাট্য সংলাপের আর একটি অন্যতম গুণ বলে মনে করেন নাট্যকার উৎপল দত্ত। তবে তিনি সতর্ক করে দিয়ে বলেন—

“তবে যে নাট্যকারের কবিত্বশক্তি আছে, তাঁর সংলাপের পক্ষেই তা গুণ হতে পারে, যার কবিত্ব শক্তি নেই, তিনি যদি সংলাপকে কবিত্বময় করতে যান, নাটকের পক্ষে তা অতিরিক্ত হয়ে যাবে। নাটককে নষ্ট করে দেবে।”^{১৮}

নাট্যকার মনোজ মিত্র আক্ষরিক অর্থে কাব্যচর্চা করেননি। কিন্তু তাঁর অন্তরে যে একটি কবি-মন আছে, তা প্রমাণ করে তাঁর নাটকগুলি। তাঁর অনেক নাটকের সংলাপ গদ্যের আঙিনা ডিঙিয়ে কাব্যের সৌন্দর্য্য কল্পনা ও অনুভবের জগতে পাড়ি জমায়। বস্তুত নাটকে কাব্যিক সংলাপ সৃষ্টিতে মনোজ কৃতিত্বের অস্বীকার করার উপায় নেই। ‘নাকছাবিটা’ নাটক থেকে তার কাব্যধর্মী সংলাপের দৃষ্টান্ত চয়ন করা যায়—

“জানকী।। সেই প্রথম... সেই প্রথম... সেই... সেই আমার ছোট বেলা... সেই আমার সকাল বেলা... সেই আমার সারা গাল ভিজে গেল তমালের গালের শিশিরে! ভিজিয়ে দিল। কী মিষ্টি!”^{১৯}

কাব্যধর্মী সংলাপের নিদর্শন মেলে ‘সাজানো বাগান’ নাটকেও। যে বাগ্গা ছকড়ি নকড়ির উদ্দেশ্যে অবলীলায় স্ল্যাঙ শব্দ ব্যবহার করতে পারে, নবজাত উত্তরপুরুষের সঙ্গে সেই বাগ্গার সংলাপে আবেগ ও সৌন্দর্যের উৎসার কবিতার মায়া ছড়ায়—

“কাঁদে না কাঁদে না ... কতো পাখি আছে আমার বাগানে...হ্যাঁ হ্যাঁ... ডালে ডালে ঘুরে বেড়ায়... হ্যাঁ, হ্যাঁ, কাল সকালে দেখো... কতো আমের বোল ধরেছে ... মুক্তোর দানার মতো মাটিতে চাদর বিছিয়ে থাকে... গুনগুন গুনগুন... কতো মৌমাছি ঝাঁকে ঝাঁকে গুনগুন করে ... হ্যাঁ হ্যাঁ ... দেখো, টুপুস টুপুস করে নাতের শিশির ঝরে পড়ছে... জলপাই-এর পাতা বেয়ে শিশির ঝরে পড়ছে...”^{২০}

যার উদ্দেশ্যে বাগ্গার এই সংলাপ সেই নবজাতক তা না বুঝলেও সংলাপের আবেশ সহজেই ছড়িয়ে যায় নাটকের পাঠক দর্শকের মনে।

মনোজের কাব্যিক সংলাপের আর এক রূপ ফুটে উঠেছে ‘দেবী সর্পমস্তা’ নাটকে। লোকজ উপাদানের আশ্রয়ে গড়ে ওঠা এই নাটকের সংলাপে ব্রজবুলির আদল আলাদা সৌন্দর্য্য এনে দিয়েছে। ব্রজবুলিতে রচিত গানটি স্মরণীয়—

“কনঠ পরে মালিকা...
কী রূপ ধরে বালিকা...
চলহ চলহ কান্তা লো
গোকুল করহ আলা লো...”^{২১}

গানের এই আবেশ সংলাপেও সঞ্চারিত হয়েছে। এখানে নাট্যকার ব্রজবুলির সঙ্গে বাংলা ও আদিবাসীদের ভাষার মিশেল ঘটিয়ে ভাষার এক মিশ্ররূপ গড়ে নিয়েছেন। যেমন -

“কুণ্ডলা।। তোহর সর্পমস্তা বয়স্থা হৈল রে সর্দার!
ডাঙ্ক।। হুঁ, ভারি হৈল! তেঁই আর কোলে তুলি নাচাতে পারবি না রে বুড়ি।
কুণ্ডলা।। পায়ের গোছাখানি হেরিস? মুঠিতে ধরে না।
ডাঙ্ক।। হুঁ! সপ্ত বরষ পার! সপ্ত বরষার বারি, বসন্তের বায়ু। সুন্দরী রূপের আগরি!
কুণ্ডলা।। বিয়ার ব্যবস্থা কর!
ডাঙ্ক।। হেঁ?
কুণ্ডলা।। পুরুষ বিনা প্রকৃতি শোভে না! যৈছন তুহু মোর শোভা!”^{২২}

নাটকটির ভাষাগত এই বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে নাটকটির প্রথম নির্দেশক দেবেশ চট্টোপাধ্যায় বলেছিলেন—

“নাটকটি পাঠের পর বুঝতে পারলাম এর বুনে একটা লোকজ উপাদান আছে এবং একটা সহজ চলনও আছে। ভাষা মিশ্র, কিছুটা ব্রজবুলি আবার তার সঙ্গে পাহাড়ের অদিবাসীদের প্যারা-ল্যাঙ্গুয়েজ মিশে আছে।”^{২৩}

এই মিশ্রভাষা নাটকের মূলভাবের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ হয়েছে সন্দেহ নেই। একদিকে নাটকের মূলভাব, অন্যদিকে শহরের ভদ্রলোক দর্শকদের কথা স্মরণে রেখে এই মিলন-মিশ্রণ ঘটিয়ে সিদ্ধকাম হয়েছেন নাট্যকার।

সিরিও-কমিক ভঙ্গির সংলাপ মনোজের নাটকের শিল্পগুণের অন্য একটি বিশিষ্টতা। ‘পুঁটিরামায়ণ’ নাটক থেকে এই রকমের একটি সংলাপ উদ্ধার করা যেতে পারে—

“পুঁটিরাম।। (সপ্রতিভ ভঙ্গিতে এগিয়ে আসে সিংহাসনের কাছে) নমস্কার... নমস্কার... নমস্কার! তাহলে এলাম, উঁ, শেষ পর্যন্ত আসতে পারলাম স্বর্ণলঙ্কা! উঃ চোখকেও বিশ্বাস হয় না! (মালপত্তর নামিয়ে) কে! এ কে! জগতের সেই আদি পুজিবাদী ধনতান্ত্রিক রাষ্ট্রব্যবস্থার নায়ক- ফার্স্ট সিটিজেন অফ স্বর্ণলঙ্কা, মহারাজ রাবণ! (করমর্দনের জন্য হাত বাড়িয়ে) হ্যাভ প্লিজ ইয়োর ম্যাজেস্টি... প্লিজ... প্লিজ... (হতচকিত রাবণ হাত বাড়িয়ে দেয়, পুঁটিরাম করমর্দন সারে) সো গ্ল্যাড টু মিট ইউ স্যার! ভাবা যায় না!...
বিভীষণ।। কোথা থেকে আসা হচ্ছে?
কালনেমি।। দেশ কোথা?
পুঁটিরাম।। হাওড়া!
সকলে।। হাওড়া!
পুঁটিরাম।। (হেসে) আপনাদের ভূগোলে নেই স্যার, ইতিহাসে আছে। ইতিহাসের যে জায়গায় আমি দাঁড়িয়ে আছি, সেখান থেকে অ্যাভাউট টার্ন করে আমি আপনাদের সকলকে দিব্যি দেখতে পাই, কিন্তু আপনারা যেখানে আছেন সেখান থেকে ফরোয়ার্ড মার্চ করেও আপনারা আমার নাগাল পাবেন না স্যার!
হে হে হে, আপনারা আমার ভূত, আমি আপনাদের ভবিষ্যৎ।”^{২৪}

মনোজ মিত্রের উদ্ভাবনী শক্তি, অভিনব কল্পনা ও সৃজন নৈপুণ্যের নিদর্শন এই সংলাপ এবং এই রকমের সংলাপ ছড়িয়ে আছে গোটা নাটকে। পুঁটিরাম, যে কিনা বিংশ শতাব্দীর হাওড়া থেকে সময়ের উজান ঠেলে রামায়ণের লঙ্কায় পৌঁছে যাবে এবং রাবণের সোনার লঙ্কায় সর্বনেশে পশ্চিমবঙ্গীয় গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করে তার বারোটা বাজাবে, প্রথম সংলাপেই সে তার পরিচয় স্পষ্ট করে দিয়েছে।

সংলাপ সৃষ্টিতে মনোজের অন্য ধরনের কৃতিত্ব ধরা পড়েছে ‘নৈশভোজ’ নাটকে। ‘নৈশভোজ’ নাটকে দুই শৈ্যালকে চরিত্র রূপে হাজির করা হয়েছে। অনেক নাটকেই এই পথে হেঁটেছেন নাট্যকার। ‘কাকচরিত্র’, ‘মেষ ও রাক্ষস’, ‘পুঁটি রামায়ণ’, ‘রঙের হাট’ প্রভৃতি নাটকে মনুষ্যের প্রাণীদের প্রত্যক্ষ উপস্থিতি লক্ষ্যনীয়। এদের মুখে যে সংলাপ বসিয়েছেন, তার বাস্তবতা না খোঁজাই ভালো। এদের রূপকে নাট্যকার মানব চরিত্রের বিভিন্ন দিককে ইঙ্গিত করেছেন। ‘নৈশভোজ’ নাটকে শুরুতেই শৈ্যালের সংলাপ রচনার আবহাটা নির্মাণ করে নেন। জঙ্গলের মাঝখানে কুণ্ডুবাবুদের মস্ত বড় ফলবতী

কাঁঠাল গাছ। উঁচু উঁচু ডালগুলোতে অজস্র ফলের সমারোহ। তারই তলে দেখা যাচ্ছে এক জোড়া শেয়াল- বুড়ো হুয়া আর কচি হুকা— উর্দ্ধমুখে কাঁঠালের দিকে লুন্ধ চোখে চেয়ে বসে আছে।

“হুয়া ও হুকা।। পড়... পড়... পড়... পড়... পড়... পড়...”

[কাঁঠাল পড়ছে না। শেয়াল দুটি বারবার লালা ঝেড়ে ফেলে দফায় দফায় ভজনা করছে... পড়, পড় পড়। শেষ পর্যন্ত বুড়ো হুয়া হতাশ ক্লান্ত হয়ে উঠল]

হুয়া।। ওরে হুকা...

হুকা।। বলরে হুয়া...

হুয়া।। রাত কত হলো?

হুকা।। জোছনা ফুটলো... দেখিস না?

হুয়া।। আর জোছনা! সোনা, পেটে ছুঁচো মারছে ঠোনা। তিন রাত্তির উপোষ করে জিভে ধরেছে নোনা।”^{২৫}

ক্ষুধার্তের কাছে পূর্ণিমার চাঁদ যে ঝলসানো রুটি, চাঁদের মায়বী আলো যে নিরর্থক— এই নিষ্করণ সত্য আভাষিত হলেও মনোজের সংলাপ সেই কারুণ্যকে কাটিয়ে দর্শকদের কৌতুক হাস্যে স্নাত করে। ধ্বনিসাম্য তথা অনুপ্রাসের ব্যবহার শেয়ালদের সংলাপকে উপভোগ্য করেছে।

সংক্ষিপ্ততা নাট্য-সংলাপের অবশ্য-কাম্য বৈশিষ্ট্য। সংলাপ ছোট হলেই তাতে আসে নাটকীয় গতি। দীর্ঘ সংলাপ নাট্যগতিকে শুধু মন্তব্যই করে না, তাতে বাস্তবিকতার অভাবও দেখা যায়— এমনটা মনে করা হয়। প্রসঙ্গত স্মরণ করা যায় নাট্যাত্তিক ড. সাধন কুমার ভট্টাচার্যের একটি মন্তব্য—

“গ্রিকনাটকের, এলিজাবেথীয় যুগের নাটকের, এবং সংস্কৃত নাটকের পাত্র-পাত্রীরা বিশেষ বিশেষ পরিস্থিতিতে যেরূপ দীর্ঘ সংলাপে ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া দেখিয়েছে, তাতে ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার সাধারণ রূপটি প্রতিফলিত হলেও, যথার্থ বাস্তবিক রূপটি-আধুনিক রুচিসম্মত বাস্তবিকতা— পাওয়া যায় না।”^{২৬}

মনোজের নাট্যভাষারে দীর্ঘ সংলাপ কম নেই। তবে সেখানে বাস্তবতার অভাব ঘটেছে একথা বলা যাবে না। আসলে আজকের নাটক শুধু বাইরের ঘটনাকেই দৃশ্যায়িত করে না, চরিত্রের অন্তরের আনন্দ-বেদনা, ভাব-অনুভূতিকেও আভাসিত করতে চেষ্টা করে। পুরনো দিনের নাটকে দীর্ঘ স্বগতোক্তি ব্যবহার করে নাট্যকারেরা সে কাজটি করতে পারতেন। আধুনিক নাটকে সে সুযোগ কম। তাছাড়া একালের পাঠক-দর্শক চরিত্রের মনোলোকের উদঘাটন আশা করে বেশি। সে কারণেই নাটকের দাবি মেনে কখনও কখনও সংলাপকে দীর্ঘ করতে হয়েছে তাঁকে। আবার অনেক সময় নাট্যচরিত্রটি মঞ্চে প্রায় একা থাকে। যেমন ‘সাজানো বাগানে’ ভূত ছকড়ি অন্য চরিত্রদের কাছে অদৃশ্য। ফলে অন্যদের সঙ্গে তার সংলাপ আদান-প্রদানের সুযোগ নেই। প্রায় স্বগতোক্তির রূপ নিয়েছে তার দীর্ঘ সংলাপ। দীর্ঘ সংলাপ বাঙ্গুর মুখে শোনা গেছে কয়েকবার। তার প্রলম্বিত সংলাপে ভয়ভীতি প্রকাশিত হয়েছে, প্রকাশিত হয়েছে তার বেঁচে থাকার সংকল্পও। এই দীর্ঘ সংলাপ দর্শকদের বিরক্তি আনে না, তাদের কাছে অবাস্তব বলেও মনে হয় না। শতবর্ষের কাছে দাঁড়িয়ে দীর্ঘ সময় একা একা কাটানো মানুষটা যে নিজের মনে বকবক করবে এটাই স্বাভাবিক।

ছোট সংলাপের ওপরেই যে নাট্যদ্বন্দ্ব, নাট্যগতি নির্ভর করে তা সর্বজনবিদিত। সাম্প্রতিক কালের সবচেয়ে জনপ্রিয় নাট্যকার মনোজ মিত্র এ বিষয়ে সচেতন ছিলেন না এমনটা নয়। তাঁর নাটকেও ছোট ছোট সংলাপের অভাব নেই। অজস্র বেগবান ও দ্বন্দ্বমুখর মুহূর্ত তাঁর নাট্যসম্ভারে ছড়িয়ে আছে। অন্যতম জনপ্রিয় একটি নাটক থেকে সামান্য দৃষ্টান্ত গ্রহণ করা যায়—

“কর্তা।। (কানাইকে) শিঙি! শিঙি! মাছ আনবি শিঙি!

গিন্নি।। না, না— বেলে— বেলে!

কর্তা।। (জোরে) শিঙি-ই-ই!

গিন্নি।। বেলে-এ - [বিপর্যস্ত কানাই দু'কানে আঙুল ঢোকায়]

কর্তা।। আমি বলছি তুই শিঙি মাছ আনবি।

গিন্মি।। খবদাঁর! বেলে মাছ!
কর্তা।। উ! বেলে! যতো এলেবেলে মাছ! (বকুলকে দেখে) ও শালা মাছ-ই না বুঝলে বকুল। বেলে,
খেলে আর না-খেলে...
গিন্মি।। আহা যত মাছ ওনার শিঙি! শিঙি ফোঁকো...
কর্তা।। রক্ত আছে!
গিন্মি।। তাহলে ব্যাডব্যাংকে গিয়ে রক্ত খেলেই হয় - মাছ খেয়ে কী লাভ, বল বকুল!”^{২৭}

এই ছোট ছোট সংলাপ নিঃসন্দেহে মনোজের সংলাপ রচনার দক্ষতার পরিচয় দেয়। পাশাপাশি দুই চরিত্রের স্বরূপ উন্মোচিতও করে। সেই সঙ্গে দর্শকদের মগ্ন করে কৌতুকহাস্যে। ‘বেলে— এলেবেলে’ বা ‘বেলে--খেলে আর না খেলে’-বেলে ও শিঙি মাছকে নিয়ে যে এমন অনুপ্রাসবহুল দাম্পত্য কলহ যে উপভোগ্য হতে পারে, মনোজ মিত্র তা দেখালেন।

মনোজ মিত্রের অন্যতম উল্লেখযোগ্য নাটক অশ্বখামা। মাত্র তিনটি চরিত্রের আশ্রয়ে গড়ে ওঠা এই নাটকে সংলাপকে স্থানে স্থানে অদ্ভুত কৌশলে ব্যবহার করেছেন। সংলাপ রেখেছেন অত্যন্ত ছোট ছোট এবং তার মধ্য দিয়ে কখনো অতীতের ঘটনা, কখনো বা ঘটতে চলা ভবিষ্যতকে তুলে ধরেছেন। কৃতবর্মা ও কৃপাচার্যের বাকবিনিময়ের একটি অংশ উদ্ধারযোগ্য -

“কৃত।। আমরা রাজার বাহিনী! ব্যর্থতা মানি না! ভুলে গেলে, ওদের মারতে কতো না কৌশল করেছি
আমরা! একবার...একবার কৌশলে গৃহবন্দী করে...
কৃপ।। কৌশলে জতুগৃহে আগুন লাগিয়েছি আমরা...
কৃত।। জীবন্ত দাহন হবে পাণ্ডব...
কৃপ।। কিন্তু হয়নি! লেলিহান অগ্নিকুণ্ড মাথায় নিয়ে বেরিয়ে এসেছে ওরা! পরিত্রাতা পাঁচটি চণ্ডাল! ওদের
হয়ে মৃত্যুবরণ করেছে তারা... ওরা জীবিত!
কৃত।। (ক্ষণেক বিরতি) এবার পাঠিয়েছি বনে...
কৃপ।। কৌশলে অজ্ঞাতবাসে বাধ্য করে...
কৃত।। জনপদ থেকে বিতাড়িত করে...”^{২৮} ২/৫৯-৬০

এখানে পুরনো ঘটনা সবার জানা। কিন্তু সংলাপের চমৎকারিতে দর্শকদের মনে জেগে ওঠে কৌতুহল, একটা উত্তেজনা অনুভূত হয়, যা সার্থক সংলাপের অন্যতম লক্ষণ।

নাট্য সংলাপের মূল কাজ কাহিনি ও চরিত্রকে প্রকাশ করা। নাট্যতত্ত্ববিদ বলেন—

“নাট্য রচনায় বাক্যের মুখ্য দায়িত্ব চরিত্রের কায়িক-মানসিক-বাচনিক আচরণের রূপটি প্রকাশ করা,
এককথায় চরিত্রকে ব্যক্ত করা। মোটকথা ব্যক্তির ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করাই মুখ্য কার্য।”^{২৯}

কিন্তু নাট্য সংলাপের কাজ এখানেই শেষ হয় না। একালের প্রখ্যাত নাট্যব্যক্তিত্ব রুদ্রপ্রসাদ সেনগুপ্ত মনে করেন—

“নাট্য-সংলাপ হচ্ছে তাই, যা শুধু তথ্য দেয় না, শুধুমাত্র ইনফরমেশন নয়, যা দর্শককে দেয় অভিজ্ঞতা,
দেয় আনন্দ। শ্রেষ্ঠ নাট্য-সংলাপ দর্শকের কাছে একটা অভিজ্ঞতা, একটি উপলব্ধি যার অভিব্যক্তি
আনন্দে। তথ্য, অভিজ্ঞতা প্রভৃতি থেকে উত্তীর্ণ হলে আসে উপলব্ধি— আসে আনন্দ।”^{৩০}

অভিজ্ঞতা ও উপলব্ধির আলোয় উজ্জ্বল নাট্যসংলাপ মণিমুক্তোর মতো ছড়িয়ে আছে মনোজের নাট্যসম্মানে। আমরা মাত্র কয়েকটি দৃষ্টান্ত চয়ন করব এখানে—

১. “জীবন বড় অদ্ভুত, না? আমি যাকে চাইলাম তাকে পেলাম না, আমাকে যে চাইল সে পাবে না জেনেই চাইল...
যে আমাকে বাঁচালো সে আমাকে পেল না...যার পাবার কথা না সে আমাকে সব দিল... ঘর সংসার সুখ শান্তি
ছেলে মেয়ে নাতিপুতি বিভবৈভব... কী আশ্চর্য জগত...”^{৩১}
২. “...এ জগত অলৌকিক শক্তির দ্বারা চালিত নয়। মানুষ যা করে তা নিজের সঞ্চয়ে করে। অন্যে দায়ী নয়।
আমার পাপ, আমার লজ্জা... আমার... আমার...”^{৩২}

৩. “...যে সব রাজার অন্তরে ভয় থাকে, সিংহাসন যখন তখন ওলটাতে পারে, তারা শুধু গোছানোর পথ ধরে, বুঝে...! আজও ধরে... হাজার হাজার বছর পরেও ধরবে!”^{৩৩}
৪. “যা তোমার না, তা কোনোদিন ধরা যায় না! কেন মিছে হাত বাড়াও! যা তোমার, তারে তুমি চিনে নাও!”^{৩৪}
৫. “আজ্ঞে মানুষ জীবনে অনেক ভেক ধরে, মরণে কিছু বেড়ে ফেলে।”^{৩৫}
৬. “নিজের পরের ও সব কোনো কথা না রে দেবাহুতি। একবার চোখ বন্ধ করে ভাব... দেখবি আপন পর সব একাকার হয়ে যাচ্ছে।”^{৩৬}
৭. “মহারাজ, চিরদিন রাজারাই খায় পেটে, আর প্রজারাই খায় পিঠে!”^{৩৭}
৮. “চাষার ভাগ্য চাষা ছাড়া কে ফিরালো ভবে?”^{৩৮}
৯. “মানুষের কাজ মানুষই করবে। মানুষের শত্রুকে মানুষই মারবে। মানুষের বুকে তুমি চৈতন্য জাগিয়েছ, এবার তাদের ভালোমন্দ তারাই বেছে নিক... তাদের পথ তারা খুঁজে নিক।”^{৩৯}
১০. “...আমাদের গর্ব... আমাদের আশা আমাদের ভবিষ্যৎ আমাদের দেশের যৌবন আজ একটা চতুষ্পদ জানোয়ার হয়ে আমাদেরই বুকের ওপর দাপাদাপি করে...”^{৪০}

অভিজ্ঞতা, অনুভূতি আর উপলব্ধির আলোয় বর্ণনায় এমন অজস্র সংলাপ মনোজের নাটকে দিয়েছে আশ্চর্য আনন্দোদ্ভূত। সংলাপগুলির অধিকাংশ বেদনা-করণ আবহে উচ্চারিত হয়েছে নাট্য চরিত্রদের কণ্ঠে কিন্তু নিঃসন্দেহে সেগুলি দর্শক-পাঠককে এক অনন্য আনন্দের আনন্দ দেয়।

Reference:

১. ঘোষ, ড. অজিতকুমার, নাটকের কথা, সাহিত্যলোক, কলকাতা, মাঘ ১৪১২, পৃ. ৪৪
২. রায়, ড. মন্থ, সাক্ষাৎকার অর্ধেন্দু মুখোপাধ্যায়, নাট্য সংলাপ : মঞ্চ ও পরিপ্রেক্ষিত, বুকস ওয়ে কলকাতা, জানুয়ারি ২০০৯, পৃ. ১৯১
৩. চট্টোপাধ্যায়, মোহিত, সাক্ষাৎকার অর্ধেন্দু মুখোপাধ্যায়, নাট্য সংলাপ : মঞ্চ ও পরিপ্রেক্ষিত, পূর্বোক্ত, পৃ. ২০৮
৪. মিত্র, মনোজ, সাক্ষাৎকার দৈনিক স্টেটসম্যান, ০৬.০৮. ২০০৫
৫. দত্ত, উৎপল, সাক্ষাৎকার অর্ধেন্দু মুখোপাধ্যায়, নাট্য সংলাপ : মঞ্চ ও পরিপ্রেক্ষিত, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৯৫-১৯৬
৬. মিত্র, মনোজ, চাকভাঙা মধু, নাটক সমগ্র ১, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স, কলকাতা, মাঘ ১৪০৯, পৃ. ২১
৭. মিত্র, মনোজ, পালিয়ে বেড়ায়, নাটক সমগ্র ৪, পূর্বোক্ত, ভাদ্র ১৪১৫, পৃ. ৬১
৮. মিত্র, মনোজ, আমি মদন বলছি, নাটক সমগ্র ২, পূর্বোক্ত, ফেব্রুয়ারি ২০০৮, পৃ. ৪৪৩
৯. ঘোষ, ড. জগন্নাথ, সাজানো বাগানের কথা, মনোজ মিত্রের সাজানো বাগান এক সর্বজনীন বিশ্বজনীন নাটক, (স) নৃপেন্দ্রনাথ সাহা, কোডেক্স, প্রকাশকাল অনুলিখিত, পৃ. ৭৪
১০. মিত্র, মনোজ, সাজানো বাগান, নাটক সমগ্র ২, পূর্বোক্ত, পৃ. ৬
১১. মিত্র, মনোজ, স্মৃতিসুধা, নাটক সমগ্র ৪, পূর্বোক্ত, পৃ. ২৪৩
১২. মিত্র, মনোজ, টু-ইন-ওয়ান, নাটক সমগ্র ২, পূর্বোক্ত, পৃ. ৪১৩
১৩. মিত্র, মনোজ, সত্যি ভূতের গল্পো, নাটক সমগ্র ৫, পূর্বোক্ত, মাঘ ১৪১৩, পৃ. ৩২৪
১৪. মিত্র, মনোজ, নরক গুলজার, নাটক সমগ্র ৩, পূর্বোক্ত, আষাঢ় ১৪১৬, পৃ. ৬৩
১৫. তদেব, পৃ. ৬৭-৬৮
১৬. মিত্র, মনোজ, গল্প হেকিমসাহেব, নাটক সমগ্র ৩, পূর্বোক্ত, পৃ. ১১১
১৭. তদেব, পৃ. ১৫১
১৮. দত্ত, উৎপল, সাক্ষাৎকার অর্ধেন্দু মুখোপাধ্যায়, নাট্য সংলাপ: মঞ্চ ও পরিপ্রেক্ষিত, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৯৫-১৯৬
১৯. মিত্র, মনোজ, নাকছাবিটা, নাটক সমগ্র ৪, পূর্বোক্ত, পৃ. ৪২

২০. মিত্র, মনোজ, সাজানো বাগান, নাটক সমগ্র ২, পূর্বোক্ত, পৃ. ৪৯
২১. মিত্র, মনোজ, দেবী সর্পমন্তা, নাটক সমগ্র ৩, পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৪৯
২২. তদেব, পৃ. ৩৫৩
২৩. চট্টোপাধ্যায়, দেবেশ, দেবী সর্পমন্তা নাট্যনির্মাণ প্রসঙ্গে, স্যাস নাট্যপত্র ৩০, ১৪২০, পৃ. ৩০
২৪. মিত্র, মনোজ, পুঁটিরামায়ণ, নাটক সমগ্র ১, পূর্বোক্ত, ৩০০
২৫. মিত্র, মনোজ, নৈশভোজ, নাটক সমগ্র ১ পূর্বোক্ত, পৃ. ২৪৯
২৬. ভট্টাচার্য, ড. সাধনকুমার, নাটক লেখার মূলসূত্র, দেজ পাবলিশিং, পৃ. ১০৫
২৭. মিত্র, মনোজ, দম্পতি, নাটক সমগ্র ৩, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৮৫-১৮৬
২৮. মিত্র, মনোজ, নাটক সমগ্র ২, পূর্বোক্ত, পৃ. ৫৯-৬০
২৯. ভট্টাচার্য, ড. সাধনকুমার, নাটক লেখার মূলসূত্র, পূর্বোক্ত, পৃ. ১০২
৩০. সেনগুপ্ত, রুদ্রপ্রসাদ, সাক্ষাৎকার অর্ধেন্দু মুখোপাধ্যায়, নাট্য সংলাপ মঞ্চ ও পরিপ্রেক্ষিত, পূর্বোক্ত, পৃ. ২১৪
৩১. মিত্র, মনোজ, স্মৃতিসুধা, পূর্বোক্ত, পৃ. ২৬৭
৩২. মিত্র, মনোজ, ছায়ার প্রাসাদ, নাটক সমগ্র ৪, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৪৭
৩৩. মিত্র, মনোজ, রাজদর্শন, নাটক সমগ্র ২, পূর্বোক্ত, পৃ. ১১৩
৩৪. মিত্র, মনোজ, রাজদর্শন, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৩৫
৩৫. মিত্র, মনোজ, কিনু কাহারের খেটার, নাটক সমগ্র ৩, পূর্বোক্ত, পৃ. ২৩১
৩৬. মিত্র, মনোজ, অলকানন্দার পুত্রকন্যা, নাটক সমগ্র ১, পৃ. ১৬৪
৩৭. মিত্র, মনোজ, রাজার পেটে প্রজার পিঠে, রাজা গজা দশ মজা, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স, মাঘ ১৪২১, পৃ. ২৭
৩৮. মিত্র, মনোজ, শিবের অসাধি, নাটক সমগ্র ২, পূর্বোক্ত, পৃ. ২৯৪
৩৯. মিত্র, মনোজ, শিবের অসাধি, পূর্বোক্ত, পৃ. ৩১৯
৪০. মিত্র, মনোজ, মেঘ ও রাক্ষস, নাটক সমগ্র ১, পূর্বোক্ত, পৃ. ৯২

Bibliography:

আকর গ্রন্থ :

- মিত্র, মনোজ, নাটক সমগ্র ১, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স, কলকাতা, মাঘ ১৪০৯
মিত্র, মনোজ, নাটক সমগ্র ২, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স, কলকাতা, ফেব্রুয়ারি ২০০৮
মিত্র, মনোজ, নাটক সমগ্র ৩, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স, কলকাতা, আষাঢ় ১৪১৬
মিত্র, মনোজ, নাটক সমগ্র ৪, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স, কলকাতা, ভাদ্র ১৪১৫
মিত্র, মনোজ, নাটক সমগ্র ৫, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স, কলকাতা, মাঘ ১৪১৩
মিত্র, মনোজ, রাজা গজা দশ মজা, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স, কলকাতা, মাঘ ১৪২১

সহায়ক গ্রন্থ :

- ঘোষ, ড. অজিতকুমার, নাটকের কথা, সাহিত্যলোক, কলকাতা, মাঘ ১৪১২,
দাস, পুলিন, নাট্য নিরীক্ষণঃ মঞ্চদর্পণে, এম.সি.সরকার অ্যান্ড সন্স, কলকাতা, ২০০২
দে, ড. অপূর্ব, নাট্য-ব্যক্তিত্বের মুখোমুখি, দিয়া পাবলিকেশন, ২০১২
ভট্টাচার্য, ড. সাধনকুমার, নাটক লেখার মূলসূত্র, দেজ পাবলিশিং,
ভট্টাচার্য, ড. সাধনকুমার, নাটকের রূপ রীতি ও প্রয়োগ, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, ১৯৯৬
মুখোপাধ্যায়, ড. অর্ধেন্দু, নাট্য সংলাপঃ মঞ্চ ও পরিপ্রেক্ষিত, বুক্স ওয়ে, কলকাতা, ২০০৯

রায়, বাসবী শুভ্র মজুমদার, নাটকের নানা রং, নাট্য শোধ সংস্থান, কলকাতা, ২০১৬

সরকার, পবিত্র, নাট্যমঞ্চ নাট্যরূপ, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, ২০০৮

সাহা, নৃপেন্দ্রনাথ (স), মনোজ মিত্রের সাজানো বাগান এক সর্বজনীন বিশ্বজনীন নাটক, কোডেক্স, প্রকাশকাল অনুল্লিখিত,

পত্রিকা :

স্যাস নাট্যপত্র, সম্পাদক সত্য ভাদুড়ী, সংখ্যা ৩০, ১৪২০